আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সোনালী ঐতিহ্য

রিদওয়ানুল হক শামসী

“আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া” শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়; বরং একটি বিপ্লব, একটি ইতিহাস। এটি কেবল একটি মাদরাসা নয়; বরং বাংলাদেশে ইসলামের বিশুদ্ধতম কেন্দ্রভূমি। এটি নিছক একটি প্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি আন্তর্জাতিক মানের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। এদেশ, এদেশের মাটি ও মানুষের উপর যে কোন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় জামিয়ার অবদান অনেক অনেক গুণ বেশি। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার, কওমী মাদরাসাসমূহকে এক সিলেবাসের অধীনে অন্তর্ভূক্তকরণ; উলামায়ে কেরামকে আধুনিক ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতকরণ এবং দেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোকে এক প্লাটফর্মে দাঁড় করানোতে জামিয়ার ভূমিকা চিরস্মরণীয় এবং ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় পটিয়া মাদরাসার সহযোগিতা ইতিহাসের পাতায় সোনালী অক্ষরে লিপিবব্ধ থাকবে।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে পটিয়া শহরে অবস্থিত। এই শহরের পূর্বে সারি সারি পর্বতমালা, উত্তরে কর্ণফুলী নদী, দক্ষিণে সাঙ্গো নদী এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। এর বুক বেয়ে চলে গেছে- বিশ্বরোড (আরকান রোড) ও রেল লাইন। জলপথেও চলাচলের সুবিধা বিদ্যমান।

জামিয়া প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও কারণ

বলাবাহুল্য পটিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে আধুনিক শিক্ষার নিমিত্তে পাশাপাশি দুটি উন্নত মানের উচ্চবিদ্যালয় বহুপূর্বেই স্থাপিত হয়েছে। আর পটিয়া শহরের চতুষ্পার্শ্বে একই ধরনের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ বিদ্যমান রয়েছে। যার ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা সর্বাধিক, বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাও কম নয়। এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংখ্যাও রয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে! এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাংস্কৃতি এবং তথাকথিত প্রগতির ভয়াবহ সয়লাবের পাশাপাশি নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহীতা ও ধর্মহীনতার প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে গ্রাস করে নিয়েছিল পটিয়া এলাকাকে। অন্যদিকে ধর্মের নামে অধর্ম, সংস্কারের নামে কুসংস্কার, সভ্যতার নামে বর্বরতা এবং সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

এমনকি পটিয়া শহরটি অদ্যাবধি চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টিত হয়েই রয়েছে বিরাট বিরাট মাজার তথাকথিত দরগাহ দ্বারা। যার কারণে শিরক, বিদ‘আত ও কবরপূজা-মাজারপূজা ইত্যাদি গোমরাহীর বিভীষিকাময় বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বহুকাল পূর্ব হতে। সুতরাং অত্র এলাকার সরলপ্রাণ সাধারণ মুসলমানগণ ধর্মহীনতা, বর্বরতা, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। পক্ষান্তরে সঠিক দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষা এবং ইসলামি তাহজীব-তামাদ্দুনের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা না থাকায় পটিয়ার অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয় ও একেবারে নৈরাশ্য জনক। এই ঘোর অমানিশার মাঝে পটিয়ার গগনে উদিত হল সৌভাগ্যের কাঙ্ক্ষিত তারকা।

১৩৫৭ হিজরী। এ বছরটি ছিল পটিয়ার জন্য একটি সোনালী বছর। এই বছরের সূচনালগ্নে ফকীহুন্নাফস হযরত মাও. রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর বিশিষ্ট খলিফা শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা শাহ জমিরুদ্দীন আহমদ রহ. এর দ্বীনদরদ দ্বীপ্ত হৃদয়ে পটিয়া মাদরাসা স্থাপনের নেক ইচ্ছা জাগ্রত হল। এই কলবী ইচ্ছার (ইলকা) আলোকে শাহ জমিরুদ্দীন রহ. তার বিশিষ্ট খলিফা, ক্ষণজন্মা আলেমে দ্বীন ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা মুফতি আজিজুল হক রহ. কে তার ইচ্ছার কথা জানালেন। তিনি বললেন, পটিয়ার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে দ্বীনের সূর্য উদিত হওয়ার সময় সমাসন্ন। পটিয়া হল কেন্দ্রীয় স্থান, এর মাধ্যমে আরো বহু এলাকা আলোকিত হতে পারে।

হযরত মুফতি সাহেব রহ. তখন জিরি মাদরাসার শিক্ষকতায় রত। শায়খের ইচ্ছা, আশা ও আদেশের প্রেক্ষিতে তিনি হযরত আহমদ রহ. (ইমাম সাহেব হুজুর) সহ ১৩৫৭ সালের শাওয়াল মাসে এক জুমাবার কয়েকজন উলামায়ে কেরামকে নিয়ে পটিয়া সদরের অদূরে তুফান আলী মুনশী মসজিদে **'জমিরিয়া কাসেমুল উলুম'** নামে একটি মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। সেদিন থেকেই শুরু হলো পটিয়ার ইতিহাসের পালাবদল ও সৌভাগ্যের পটপরিবর্তন। শুরু হলো পটিয়ার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হতে মেঘখন্ডের বিদূরণ। কিছুদিন পর পরিস্থিতি ও পরিবেশ বিবেচনা পূর্বক মাদরাসাটি স্থানান্তরিত হয় পটিয়া সদরের পূর্বে মনুমিয়া দফাদারের মসজিদে। তারও কিছুদিন পর বর্তমান জামিয়ার উত্তর পাশে একটি খালি দোকান ঘরে নিয়ে আসা হয় মাদরাসাটি। অতঃপর মাদরাসা স্থানান্তরিত হয় বর্তমান জায়গায়।

জামিয়ার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতি আজিজুল হক রহ. প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মাদরাসার প্রধান পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা এবং মাদরাসার সার্বিক কার্যাদি সম্পাদনে যে কতিপয় যোগ্য ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মাদরাসাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ছিলেন, তাদের মধ্য হতে অন্যতম ছিলেন হযরত মুফতি সাহেব রহ. এর পীরভাই হযরত মাওলানা আহমদ সাহেব (ইমাম সাহেব হুজুর রহ.), হযরত মাওলানা ইস্কান্দর সাহেব রহ. হযরত মাওলানা আমজাদ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেব রহ. প্রমুখ। এমন এক বিরল কায়দায়, অনেকটা অলৌকিক ভাবে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার যাত্রা শুরু হয় অবিরাম দূর্বার গতিতে। এমনকি এক সময় এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কালের গতি ভেদ করে। সময়ের উজান স্রোত পাড়ি দিয়ে, সময়ের সাথে যোগ্য পাল্লা দিয়ে, পৌঁছে যায় শেকড় থেকে শিখরে।

ক্ষণজন্মা ওলীয়ে কামেল হযরত মাওলানা হাজী শাহ মুহাম্মদ ইউনুছ সাহেব ১৩৭৭ হি.সনে অস্থায়ী ভাবে এবং ১৩৭৯হি. সনে স্থায়ীভাবে জামিয়ার পরামর্শ পরিষদে গুরু দায়িত্ব হযরত হাজী সাহেব হুজুরের কাঁধে অর্পিত হয়। ১৩৮০ হি. ১৫ই রমজান জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কুতুবে জামান হযরত মুফতি আজিজুল হক রহ. আপন মাহবুবে হাকিকীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। হযরতের ইন্তেকালের পর হযরত হাজী সাহেব হুজুর নিজ ঈমানি শক্তি দ্বারা মাদরাসাকে এগিয়ে নিলেন বহুদূর। ছোট্ট মাদরাসাটিকে পরিণত করলেন জামিয়ায়। চিন্তা, চেষ্টা, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, মনোবল ও তাকওয়া দ্বারা তিনি জামিয়াকে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দিলেন। শুধু তাই নয় সুউচ্চ মিনারা, আকাশচুম্বী অট্টালিকা ও নতুন আঙ্গিকে ভবন-নির্মাণের

মাধ্যমে তিনি রচনা করলেন মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের এক গৌরবময় নিদর্শন।

এক কথায় যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম, যাবতীয় সুন্দর ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, স্থায়ী আর্থিক খাত সঞ্চয়, দেশব্যাপী সুনাম, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত এসব কিছু তারই হাতে হয়েছে। ১৪১২ হি. মোতাবেক ১৯৯২ ইং (১৪ ফেব্রুয়ারি) জুমাবার এ অলীয়ে কামেল মাহবুবে হাকিকীর কাছে ফিরে যান। তার ইন্তেকালের পর এ গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় পটিয়ার আরেক ক্ষণজন্মা প্রতিভা যুগের বিরল ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম, বহু ভাষার পণ্ডিত প্রথিতযশা সাহিত্যিক , হযরত আল্লামা শায়খ হারুন ইসলামাবাদী রহ. এর উপর। তার জ্ঞান, যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার বরেণ্য পরিচিতির কারণে জামিয়ার দেহ-মনে সৃষ্টি হয় নতুন গতি ও চাঞ্চল্য।

তার হাতে সুচিত হয় জামিয়ার বিকাশের নতুন ধারা। তিনি জামিয়ারসমূহ কার্যাবলীতে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজাতে সমর্থ হন। এভাবে তিনি জামিয়ার তৃতীয় সফল প্রধান পরিচালক হিসেবে কর্মরত থেকে অবশেষে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে তিনিও (মাত্র ৬৪বছর বয়সে) মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। তার ইন্তেকালের পর উসতাজুল আসাতিজা আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম সাহেব হুজুর রহ. কে দিয়ে প্রধান পরিচালকের পদ অলঙ্কৃত করা হয়। শতবর্ষ ছুঁই ছুঁই এ আল্লাহর অলীর শারীরিক দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য করে তুখোড় মেধাবী ব্যক্তিত্ব, জামিয়ারই কৃতি সন্তান আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী দা.বা. এর হাতে সোপর্দ করা হয় এ গুরুদায়িত্ব। আর কদীম সাহেব হুজুরকে রাখা হলো সদরে মুহতামিম এর আসনে।

এই দায়িত্ব পরিবর্তনের কিছুদিন পরই ২৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে তিনি রাব্বুল আলামিনের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান প্রকৃত ঠিকানায়। বর্তমানে আল্লামা মুফতি আব্দুল হালিম বোখারী দা. বা. এর দক্ষ হাতের সুষ্ঠু পরিচালনায় জামিয়া তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছে। আল্লাহ তায়ালা এই মহান জ্ঞান সাধককে দীর্ঘজীবী করুন।

বর্তমানে জামিয়া

বর্তমানে জামিয়া ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারী) হিসেবে পরিগণিত। শিক্ষা-দীক্ষার বহুমুখী কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক, সেবামূলক, জনকল্যাণমূলক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন কার্যক্রমে বিশাল অবদান রেখে যাচ্ছে। জামিয়ার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

প্রশাসনিক বিভাগসমূহ

জামিয়ার যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিভাগসমূহ-

১. দফতরে এহতেমাম বা পরিচালনা বিভাগ
২. দফতরে তালিমাত বা শিক্ষা বিভাগ
৩. দারুল ইকামা বা ছাত্রাবাস বিভাগ
৪. অর্থ ও হিসাব বিভাগ
৫. মতবখ বিভাগ
৬. প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
৭. মসজিদ পরিচালনা বিভাগ
৮. নিরাপত্তা বিভাগ
৯. নির্মাণ ও ওয়াকফ বিভাগ
১০. গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিভাগ
১১. ভূ-সম্পত্তি বিভাগ।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগসমূহ

১. ইসলামি কিন্ডার গার্টেন বিভাগ : ইসলামি কিন্ডার গার্টেন-এর পাঠ্যক্রম হল-

- শিশুদেরকে আরবি বর্ণমালার বিশুদ্ধ উচ্চারণ অনুশীলন
- দেখে দেখে কুরআন পাঠ
- তাওহীদ ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা
- নামায ও অন্যান্য ইবাদতের বাস্তব প্রশিক্ষণ
- বাংলা, ইংরেজি অংক ও পরিবেশ পরিচিতি ইত্যাদি।

২. হিফযুল কুরআন বিভাগ : এ বিভাগে তাজবীদ ও কিরাত সহকারে ছাত্রদেরকে কুরআন হিফজ করানো হয়।

৩. কিতাব বিভাগ এবং স্তরসমূহ

ক) প্রাথমিক স্তর

খ) মাধ্যমিক স্তর

গ) উচ্চমাধ্যমিক স্তর

ঘ) স্নাতক স্তর

ঙ) স্নাতকোত্তর স্তর।

ইবতেদায়ী থেকে দাওরা (মাস্টার্স) পর্যন্ত এ বিভাগসমূহ জামিয়ার পাঠ্যক্রমের মৌলিক বিভাগ। এসকল বিভাগে যে বিষয়বলি পড়ানো হয় তা হলো-

- তাওহীদ
- মাসায়েল
- তাজবীদ ও কেরাত
- উর্দূ, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা
- অংক, ইতিহাস, ভূগোল
- আরবি সাহিত্য
- আরবি ভাষা

- আরবি ব্যাকরণ
- নৈতিক চরিত্র বিজ্ঞান
- রাষ্ট্র বিজ্ঞান
- সমাজ বিজ্ঞান
- ইতিহাস
- সীরাত
- তরজামাতুল কুরাআন
- সমকালীন ফিক্‌হ
- মানতিক বা তর্কশাস্ত্র
- উসুলে ফিক্‌হ
- উসুলে হাদিস
- উত্তরাধিকার আইন
- তাফসীরুল কুরআন
- কুরআন দর্শন
- হাদিস শাস্ত্র
- সাধারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা সৌর বিজ্ঞানের মূল দর্শন
- পদার্থ বিজ্ঞানের মূল দর্শন
- ইসলামি ও প্রচলিত অর্থনীতি
- পরিবেশ বিজ্ঞান
- উসুলে দ্বীন
- কালাম শাস্ত্র।

তাখাচ্ছুছাত বা বিশেষ বিভাগসমূহ

ক) দারুল ইফতা বা ফতোয়া বিভাগ : দু'বছর মেয়াদী এ বিভাগে উচ্চতর ফিক্‌হ এবং ইসলামি আইনশাস্ত্র পড়ানো হয় এবং এ বিভাগ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে।

খ) তাফসীর বিভাগ : এক বছর মেয়াদী এ বিভাগে কুরআনের উচ্চতর তাফসীর বা ব্যাখ্যা পড়ানো হয়।

গ) উলুমে হাদিস বিভাগ : এতে উলুমে হাদিস এর উচ্চতর ব্যাখ্যা এবং উসূলে হাদিস পড়ানো হয়। এ বিভাগের মেয়াদ এক বছর।

ঘ) কেরাত (তাজবীদ) বিভাগ : এ বিভাগে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ৭টি পদ্ধতি বা কেরাতে সাব'আ পড়ানো হয়। এ বিভাগের মেয়াদ দুই বছর।

ঙ) বাংলা সাহিত্য বিভাগ : এ বিভাগে উচ্চতর বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো হয় এটি বাংলাদেশের কওমী মাদরসাসমূহের মধ্যে প্রথম বাংলা বিভাগ। আর তা একমাত্র জামিয়াতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাকাল **১৯৬৫** ইং। এই বিভাগের মেয়াদ দুই বছর।

চ) আরবি সাহিত্য বিভাগ : এক বছর মেয়াদী এ বিভাগে উচ্চতর আরবি সাহিত্য পড়ানো হয়।

৫. শর্টকোর্স বিভাগ

জেনারেল বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত যারা দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করতে চায়, তাদের সল্প সময়ে আলেম করার লক্ষ্যে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। এতে ভর্তি হওয়ার জন্য এস. এস. সি/ সমমান শিক্ষার সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। এ বিভাগের মেয়াদ ছয় বছর।

অধীনস্ত বিভাগসমূহ

১. আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড)

এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে প্রায় পাঁচশত মাদরাসা নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রতি বছর এই বোর্ডের অধীনে ৬ টি শ্রেণীতে মারকাজি (কেন্দ্রীয়) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের কওমী মাদরাসাসমূহের মধ্যে একতার সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে।

২. বাংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থা

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হেফজ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও হেফজখানা সমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত হয় এ সংস্থাটি। এলক্ষ্যে সংস্থা প্রতি বছর হেফজ প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশে কুরআন মাজীদ বিশুদ্ধ ও তাজবীদের সাথে পড়ার প্রচলন মূলত এ সংস্থাটিই করেছে। এবং কুরআনের খেদমতের জন্য এটিই প্রথম সংস্থা যা জামিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮০ ইং।

৩. আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংস্থা

বর্তমানে দেশের প্রতিটি জেলায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংস্থা প্রতি বছর যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন করে থাকে তা একমাত্র জামিয়ারই প্রতিষ্ঠা। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৬ সাল।

৪. ইসলামি রিলিফ কমিটি

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সব ধরনের বিপদের সময় দূর্গত মানবতার সেবা-সাহায্য ও পূর্ণবাসনের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে এ সংস্থা। এটি বর্তমানে এনজিও ব্যুরোর তালিকাভূক্ত একটি সংস্থা। ৯১ এর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়সহ দেশের প্রতিটি প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় এটি

আর্তমানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে এবং কোটি কোটি টাকার ত্রাণ বিতরণ করেছে। বর্তমানে এর অধিনে প্রায় শতাধিক মসজিদ মাদরাসার নির্মাণাধীন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫. নও মুসলিম ফাউন্ডেশন

নও মুসলিমদের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং আর্থিক সহায়তা দানের লক্ষ্যে ১৯৯৯ ইংরেজিতে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নও মুসলিমদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশে এটিই একমাত্র সংস্থা।

এ ছাড়াও শিক্ষা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কার্যক্রম পরিদর্শন, ইসলামি গবেষণা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, দাওয়াত ও প্রকাশনা, রেজিস্ট্রেশন, হিসাব নিরীক্ষণ, আর্থিক সাহায্য ও অনুদান, সংস্কার ও প্রতিরক্ষাসহ বহু বিভাগ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ও মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক. বগুড়া জামিল মাদরাসা

দেশের উত্তরাঞ্চলে দীনের দাওয়াত এবং ইসলামি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৬০ ইংরেজিতে জামিয়া কর্তৃক বগুড়া কাসেমুল উলুম জামিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি উত্তরবঙ্গে সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

খ. ফয়জিয়া তাজবীদুল কুরআন মাদরাসা হাটহাজারী

এটি চট্টগ্রাম হাটহাজারী থানার অর্ন্তগত ইছাপুর এলাকায় অবস্থিত একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মাদরাসা ও এতিমখানা। এতে প্রায় ৬ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করছে। এতে হেফজখানা ও কেরাত বিভাগও রয়েছে।

গ. ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র বান্দরবান

এটি জামিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। জামিয়া কর্তৃক ১৯৮৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে আছে ত্রিতল বিশিষ্ট একটি সুবিশাল জামে মসজিদ, ৫০ শয্যাবিশিষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র।

ঘ. ইসলামি মিশনারী সেন্টার, সুখবিলাস রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

এটি দীন প্রচারের একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। এতে আছে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাদরাসা, হেফজখান, কৃষিখামার ও ৩০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও নও মুসলিম পুনর্বাসন প্রকল্প।

নিয়মিত প্রকাশনা

ইসলামের মহান বাণী সর্ব মহলে পৌঁছানোর লক্ষ্যে জামিয়ার নিয়মিত প্রকাশনা-

ক. মাসিক আত-তাওহীদ (বাংলা)

খ. ত্রৈমাসিক বালাগ আশ-শারক (ইংরেজী-আরবি)

গ. সাময়িক আদ-দায়েরা (আরবি)

ঘ. সাময়িক আল-আজিজ (বাংলা)।

পটিয়া মাদরাসায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

২৬ মার্চ ১৯৭১ এর ভয়াল রাত্রি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র হতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হানাদার বাহিনীর গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। নিরাপত্তার কথা ভেবে জিয়াউর রহমান বেতারের যন্ত্রপাতি এবং সৈন্যদের ট্রাকে নিয়ে সরাসরি জামিয়ায় (অত্র মাদরাসায়) চলে আসেন। এখানে এসেও তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং রাত্রে জামিয়ার মেহমান খানায় অবস্থান করেন। জামিয়ার এই গৌরবদ্বীপ্ত ইতিহাস

সাংবাদিক শাকের হোসাইন শিবলি তার **‘আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে’** বইতে উল্লেখ করেছেন।

মাদরাসা বিদ্বেষীদের ভয়াল থাবায় জামিয়া

প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি ও সুখ্যাতি দেখে বিদ্বেষে বিষিয়ে উঠল ধর্ম প্রতারক ব্যবসায়ীদের বুক। এ ছিল তাদের জন্য জঘন্য চপেটাঘাত, ছিল ভীরু মানুষের মাথায় বজ্রের গর্জন। এ আঘাত সহ্য করতে না পেরে তারা মাদরাসার প্রতি ক্ষুব্ধ করে তোলে প্রতিবেশীদের। এক পর্যায়ে তারা বিতর্ক অনুষ্ঠানের নামে দূর-দুরান্ত থেকে হাজার হাজার লোক সমবেত করে। প্রতিবেশীসহ প্রায় ১৫/২০ হাজার লোকের জমায়েত হয় এবং চতুর্দিকে মাদরাসাকে ঘেরাও করে রাখে। তখন মাদরাসায় ছিল বহু দীনি কিতাব ও পবিত্র কালামে পাকের বৃহৎ সম্ভার। তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল কম। এমন এক অবস্থায় নমরুদের কর্কশকন্ঠের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কেউ কেউ বলে উঠে আগুন ধরিয়ে দাও, তাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দাও।

এ রকম নমরুদী হিংস্র আদেশ পালনে পাগল হয়ে প্রজ্জ্বলিত আগুন দিয়ে দীনি প্রতিষ্ঠানকে জ্বালিয়ে দিতে কারো প্রাণটুকু এক লমহার জন্যও কেঁপে উঠল না। শত শত হাদিসের কিতাব এবং পবিত্র কুরআনের শব্দহীন ফরিয়াদ পাষাণদের অন্তরে বিদ্ধ হয়নি, বরং আল্লাহর কালাম, মহানবীর হাজার হাজার হাদিস ভষ্মীভূত হয়ে উড়ে গেল তাদের চোখের সামনে। মহান আল্লাহর রহমত দ্বীনের দুশমনেরা জামিয়ার গতি ও শক্তি, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি নিজেদের চোখে দেখে গিয়েছে। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার আগুনের লেলিহান শিখা দেখে নাকি হযরত মুফতি সাহেব রহ. দু’হাত তুলে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! ধোঁয়া যে টুকু উপরে উঠেছে, তুমি আমার সন্তানতুল্য প্রতিষ্ঠানকে সেটুকু উঠিয়ে দাও। বর্ণে বর্ণে কবুল হয়েছে সেই

জিগর ছেঁড়া ফরিয়াদ। তাই আজ আমরা দেখতে পাই, অগ্নির ধোয়ার উচ্চতার সমান জামিয়ার সৌধ ও অট্টালিকা।
১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আমার দেশের অতন্দ্র প্রহরীরা পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কালোঘাট বেতার কেন্দ্র ত্যাগ করে জামিয়া পটিয়াতে অবস্থান করেছিল। কিন্তু পাকবাহিনীর কালো হাত হতে সেদিন রেহায় পায়নি আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষালয়ও। হানাদাররা সেদিন জামিয়ার উপর বোমা বর্ষণ করে। সেদিন শহীদ হয়েছিলেন জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস, আল্লামা দানিশ রহ. এবং আহত হয়েছিল জামিয়ার কয়েকজন আসাতেজায়ে কেরাম। জামিয়ার জামে মসজিদের পূর্বে তখন দু'তলা বিশিষ্ট ভবন ছিল, যার উপর প্রায় আটটি বোমা বর্ষিত হয়। তার কারণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ঐ ভবন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। মহান আল্লাহর অপর কৃপায় আজ তদস্থলে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মিত হয়েছে। ইহা আমাদেরকে কুতুবে আলমের দোয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

২০০২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী অকস্মাৎ হাজার হাজার লোকের সমাগম হল পটিয়া রেলওয়ে চত্ত্বরে। কেন এত লোকের জামায়েত? তা জানার সুযোগও পায়নি জামিয়া কতৃপক্ষ। অনেকটা আচমকা আগ্নেয়াস্ত্র, দা-কিরিচ, লগি-বৈঠা, ইট-পাটকেল, পাথর ইত্যাদির দ্বারা একযোগে আঘাত আসতেছিল আল্লাহ ও রাসূলের সুরক্ষিত ঘর পটিয়া মাদরাসার উপর। সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ছিল জামিয়া। কাঁদতে ছিল জামিয়ার ছাত্র-শিক্ষক। কাঁপছিল আকাশ-বাতাস। কাঁদছিল জামিয়ার দেয়ালও। পটিয়ার ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহের সুরক্ষিত প্রাচীর, তার পাশের বিরাটকায় দালান, পরিকল্পনাধীন দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুদীর্ঘ দেয়াল কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হয়ে গেল ছায়ভস্ম। মিশে গেল ধূলিতে। দেখতে দেখতে ধ্বংস হয়ে গেল কোটি টাকার সম্পদ।

পটিয়া মাদরাসার কিছু ভবন

ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

শিক্ষা ভবন

লেখক

ছাত্র, দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স)

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া